ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে

কামিল (স্নাতকোত্তর) আল-ফিকহ বিভাগ ২য় পর্ব

ফিকহ ২য় পত্র: ফিকহুল মুআশারাহ ও মুসলিম পারিবারিক আইন

খ বিভাগ: কানুনুল উসরাতিল মুসলিমাহ (মুসলিম পারিবারিক আইন)

(রচনামূলক প্রশ্ন)

১. মুসলিম পারিবারিক আইনে বিবাহের সংজ্ঞা, উদ্দেশ্য ও রেজিস্ট্রেশনের গুরুত্ব আলোচনা কর। রেজিস্ট্রেশন না করার শাস্তি কী? (ناقش تعريف الزواج وأهدافه وأهمية تسجيله في قانون الأسرة المسلمة - وما هي عقوبة عدم التسجيل؟)

২. স্ত্রীর ভরণ-পোষণ (Maintenance) সম্পর্কে বাংলাদেশী আইনের বিধান কী? আদালত কখন দাম্পত্য অধিকার পুনরুদ্ধারের আদেশ দেন? (ما هو حكم نفقة الزوجة في القانون البنغلاديشي؟ ومتى تأمر المحكمة بإعادة الحقوق الزوجية؟)

৩. মহর (Dower)-এর সংজ্ঞা, প্রকারভেদ (তাৎক্ষণিক ও বিলম্বিত) আলোচনা কর। বিবাহ বিচ্ছেদ বা স্বামীর মৃত্যুর পর মহরের বিধান কী? (ناقش تعريف المهر وأنواعه (المعجل والمؤجل) - وما هو حكم المهر بعد الطلاق أو وفاة الزوج؟)

৪. মুসলিম পারিবারিক আইন অনুযায়ী তালাক প্রদানের প্রক্রিয়া ও শর্তাবলি সবিস্তারে আলোচনা কর। এ প্রক্রিয়ায় সালিশি পরিষদের ভূমিকা কী? (ناقش بالتفصيل إجراءات الطلاق وشروطه بموجب قانون الأسرة المسلمة - وما هو دور مجلس التحكيم في هذه العملية؟)

৫. সন্তানের বংশ পরিচয় (Paternity) ও যেনার (Illegitimacy) বৈধতা ও স্বীকৃতির ক্ষেত্রে বাংলাদেশী আইনে মুসলিম ফিকহের মূলনীতিগুলো কীভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে? (كيف تم تطبيق مبادئ الفقه الإسلامي في القانون البنغلاديشي بخصوص نسب الأطفال وشرعية الزنى والاعتراف به؟)

৬. মুসলিম পারিবারিক আইনে সম্পত্তির অভিভাবকত্ব (Guardianship of Property) সংক্রান্ত বিধানাবলি কী কী? একজন অভিভাবকের অধিকার

ও কর্তব্য আলোচনা কর। (ما هي الأحكام المتعلقة بالولاية على الأموال (في قانون الأسرة المسلمة؟ وناقش حقوق الولي وواجباته

৭. আত্মীয়দের ভরণ-পোষণ (Maintenance of Relatives) সম্পর্কে বাংলাদেশী আইনে কী বিধান রয়েছে? কোন ধরনের আত্মীয়দের জন্য ভরণ-পোষণ ওয়াজিব? (ما هو الحكم في القانون البنغلاديشي بخصوص نفقة الأقارب؟ وما هي أنواع الأقارب التي تجب عليهم النفقة؟)

৮. বিবাহের ক্ষেত্রে শরীয়ত অনুমোদিত শর্তাবলি কী কী? ফাসিদ বা বাতিল শর্তের কারণে বিবাহের হুকুম কী হয়? ফিকহ ও আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ কর। (ما هي الشروط المباحة شرعا في النكاح؟ وماذا يكون حكم النكاح بسبب الشروط الفاسدة أو الباطلة؟ حلل من منظور الفقه والقانون)

৯. ফিকহী দৃষ্টিতে 'তালাক' ও 'ফাসখ'-এর মধ্যকার পার্থক্যগুলো উদাহরণসহ বিশ্লেষণ কর। এগুলো আইনে কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে? (حلل الفروق بين "الطلاق" و "الفسخ" من الناحية الفقهية مع الأمثلة - وكيف انعكست هذه الفروق في القانون؟)

১০. মুসলিম পরিবার অধ্যাদেশ ১৯৬১-এর উদ্দেশ্য ও প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা কর। এটি মুসলিম পারিবারিক আইনে কী ধরনের সংস্কার এনেছে? (ناقش أهداف المرسوم العائلي الإسلامي لعام 1961 وميزاته - وما هي أنواع الإصلاحات التي أتى بها في قانون الأسرة المسلمة؟)

১১. দাম্পত্য অধিকার পুনরুদ্ধার (Restitution of Conjugal Rights) বলতে কী বোঝায়? কোন পরিস্থিতিতে আদালত এ অধিকার পুনরুদ্ধারের আদেশ দেন- পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ ১৯৮৫-এর আলোকে ব্যাখ্যা কর। (ما المقصود بـ "استرداد الحقوق الزوجية"؟ واشرح الظروف التي تأمر فيها المحكمة بإعادة هذا الحق في ضوء مرسوم محكمة الأسرة لعام 1985)

১২. মুসলিম বিবাহ ও তালাক (রেজিস্ট্রেশন) আইন ১৯৭৪ ও ১৯৯৪ (সংশোধিত)-এর আওতায় বিবাহ ও তালাক রেজিস্ট্রেশনের প্রক্রিয়া ও গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। রেজিস্ট্রেশন না করার শাস্তি কী? (حلل عملية تسجيل الزواج

والطلاق بموجب قانون تسجيل الزواج والطلاق الإسلامي لعامي 1974 و 1994 (المعدل) وأهميته - وما هي عقوبة عدم التسجيل؟)
১৩. স্ত্রীর ভরণ-পোষণ (Maintenance) সম্পর্কে মুসলিম পরিবার অধ্যাদেশ ১৯৬১-এর বিধানগুলো কী কী? স্ত্রী কখন ভরণ-পোষণের অধিকার হারায়? (ما هي أحكام مرسوم العائلة المسلمة لعام 1961 بخصوص نفقة الزوجة؟ ومتى تفقد الزوجة حقها في النفقة؟)
১৪. পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ ১৯৮৫ অনুযায়ী পারিবারিক আদালতের এখতিয়ার ও কার্যপ্রণালী আলোচনা কর। এ আদালত কোন কোন বিষয়ে রায় দিতে পারে? (ناقش اختصاص محكمة الأسرة بموجب مرسوم محكمة الأسرة لعام 1985 وإجراءاتها - وما هي القضايا التي يمكن لهذه المحكمة أن تحكم فيها؟)
১৫. মুসলিম পরিবার অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী তালাকের ক্ষেত্রে সালিশি পরিষদের (Arbitration Council) ভূমিকা কী? এটি কীভাবে বিচ্ছেদ কার্যকর করতে সাহায্য করে? (ما هو دور "مجلس التحكيم" في قضايا الطلاق بموجب مرسوم العائلة المسلمة؟ وكيف يساعد في تنفيذ الانفصال؟)

প্রশ্ন-১: মুসলিম পারিবারিক আইনে বিবাহের সংজ্ঞা, উদ্দেশ্য ও রেজিস্ট্রেশনের গুরুত্ব আলোচনা কর। রেজিস্ট্রেশন না করার শাস্তি কী?
(ناقش تعريف الزواج وأهدافه وأهمية تسجيله في قانون الأسرة المسلمة -. وما هي عقوبة عدم التسجيل؟)

ভূমিকা:

ইসলামে বিবাহ বা নিকাহ হলো একটি পবিত্র দেওয়ানি চুক্তি ও ইবাদত। এটি সমাজ গঠনের মূল ভিত্তি। বাংলাদেশে মুসলিম পারিবারিক আইনে বিবাহের ধর্মীয় দিকের পাশাপাশি আইনি সুরক্ষার ওপরও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে নারীদের অধিকার রক্ষার জন্য বিবাহ রেজিস্ট্রেশনকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

১. বিবাহের সংজ্ঞা (Ta'rif):

আভিধানিক সংজ্ঞা:

'নিকাহ' (النكاح) শব্দটি আরবি। এর আভিধানিক অর্থ হলো একত্রিত হওয়া (الضم) বা মিলিয়ে দেওয়া।

পারিভাষিক সংজ্ঞা (ফিকহ):

হানাফি ফিকহের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'রদ্দুল মুহতার'-এ বলা হয়েছে:

আরবি ইবারত: هُوَ عَقْدٌ يُفِيدُ مِلْكَ الْمُتْعَةِ قَصْدًا.

অর্থ: "বিবাহ হলো এমন একটি চুক্তি, যার উদ্দেশ্য হলো শরিয়তসম্মত উপায়ে স্ত্রী থেকে উপকৃত হওয়ার (সহবাসের) মালিকানা বা অধিকার লাভ করা।"

আইনগত সংজ্ঞা:

মুসলিম পারিবারিক আইনে বিবাহকে একটি 'দেওয়ানি চুক্তি' (Civil Contract) হিসেবে গণ্য করা হয়, যার মাধ্যমে একজন পুরুষ ও একজন নারীর মধ্যে বৈধ দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং একে অপরের ওপর অধিকার ও কর্তব্য বর্তায়।

২. বিবাহের উদ্দেশ্য (Objectives):

ইসলামি শরিয়ত ও আইনের দৃষ্টিতে বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্যগুলো হলো:

- **বংশরক্ষা:** বৈধ পন্থায় সন্তান জন্মদান ও মানব বংশ টিকিয়ে রাখা।
- **চরিত্র হেফাজত:** ব্যভিচার ও অশ্লীলতা থেকে সমাজকে রক্ষা করা।
- **প্রশান্তি লাভ:** স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক প্রেম ও মায়ার মাধ্যমে মানসিক প্রশান্তি অর্জন।
- **সামাজিক সুশৃঙ্খলা:** পরিবারের মাধ্যমে একটি সুশৃঙ্খল সমাজ গঠন করা।

৩. বিবাহ রেজিস্ট্রেশনের গুরুত্ব (Importance of Registration):

'মুসলিম বিবাহ ও তালাক (রেজিস্ট্রেশন) আইন ১৯৭৪' অনুযায়ী প্রতিটি মুসলিম বিবাহ রেজিস্ট্রি করা বাধ্যতামূলক। এর গুরুত্ব অপরিসীম:

- **আইনি প্রমাণ:** রেজিস্ট্রেশন বা কাবিননামা হলো বিবাহের একমাত্র দালিলিক প্রমাণ। আদালতে দেনমোহর বা ভরণপোষণ দাবি করার জন্য এটি অপরিহার্য।
- **অধিকার রক্ষা:** স্বামী মারা গেলে স্ত্রীর উত্তরাধিকার সম্পত্তি লাভ এবং সন্তানের পিতৃপরিচয় নিশ্চিত করার জন্য রেজিস্ট্রেশন জরুরি।
- **বাল্যবিবাহ রোধ:** রেজিস্ট্রেশনের সময় জন্মনিবন্ধন বা জাতীয় পরিচয়পত্র যাচাই করার ফলে বাল্যবিবাহ রোধ করা সম্ভব হয়।
- **প্রতারণা বন্ধ:** অনেক সময় পুরুষরা বিবাহ অস্বীকার করে। রেজিস্ট্রি করা থাকলে এই প্রতারণার সুযোগ থাকে না।

৪. রেজিস্ট্রেশন না করার শাস্তি (Penalty):

১৯৭৪ সালের আইনের ৫ ধারা অনুযায়ী, বিবাহ রেজিস্ট্রেশন না করা একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

- **শাস্তি:** যদি কোনো ব্যক্তি বিবাহ রেজিস্ট্রি না করে বা রেজিস্ট্রেশন করার উদ্যোগ না নেয়, তবে তাকে **২ (দুই) বছর পর্যন্ত বিনাশ্রম কারাদণ্ড** অথবা **৩,০০০ (তিন হাজার) টাকা পর্যন্ত জরিমানা** অথবা **উভয় দণ্ডে** দণ্ডিত করা হবে।

উপসংহার:

বিবাহ কেবল একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানই নয়, এটি একটি আইনি বন্ধনও বটে। ধর্মীয় ও সামাজিকভাবে বিবাহের স্বীকৃতি থাকলেও, বর্তমান প্রেক্ষাপটে আইনি সুরক্ষা নিশ্চিত করতে রেজিস্ট্রেশনের কোনো বিকল্প নেই।

প্রশ্ন-২: স্ত্রীর ভরণ-পোষণ (Maintenance) সম্পর্কে বাংলাদেশী আইনের বিধান কী? আদালত কখন দাম্পত্য অধিকার পুনরুদ্ধারের আদেশ দেন? (ما هو حكم نفقة الزوجة في القانون البنغلاديشي؟ ومتى تأمر المحكمة بإعادة الحقوق الزوجية؟)

ভূমিকা:

স্ত্রীর ভরণ-পোষণ বা 'নাফাকা' পাওয়া স্ত্রীর আইনগত ও ধর্মীয় অধিকার। স্বামী সামর্থ্য অনুযায়ী স্ত্রীর আহার, বস্ত্র ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে বাধ্য। বাংলাদেশী আইনে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট বিধান রয়েছে এবং স্বামী এই দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে স্ত্রী আদালতের আশ্রয় নিতে পারেন।

১. ভরণ-পোষণ সম্পর্কে বাংলাদেশী আইনের বিধান:

বাংলাদেশে 'মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ ১৯৬১' এবং 'পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ ১৯৮৫' অনুযায়ী স্ত্রীর ভরণ-পোষণের বিধান কার্যকর হয়।

- **ধারা ৯ (১৯৬১ অধ্যাদেশ):** স্বামী যদি যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়া স্ত্রীকে ভরণ-পোষণ না দেয় বা দিতে অবহেলা করে, তবে স্ত্রী স্থানীয় 'সালিশি পরিষদ' বা চেয়ারম্যানের কাছে আবেদন করতে পারেন। সালিশি পরিষদ স্বামীর সামর্থ্য বিবেচনা করে নির্দিষ্ট পরিমাণ মাসিক খোরপোশ ধার্য করে দিতে পারে।
- **পারিবারিক আদালত:** ১৯৮৫ সালের অধ্যাদেশ অনুযায়ী, স্ত্রী সরাসরি পারিবারিক আদালতে মামলা দায়ের করতে পারেন। আদালত স্বামীর আয়-উপার্জন ও সামাজিক মর্যাদা বিবেচনা করে অতীত ও ভবিষ্যতের ভরণ-পোষণ প্রদানের রায় দিতে পারেন।

- **বকেয়া আদায়:** নির্ধারিত ভরণ-পোষণ অনাদায়ী থাকলে তা 'ভূমি রাজস্ব' (Public Demand) হিসেবে স্বামীর কাছ থেকে আদায়যোগ্য হবে।

২. দাম্পত্য অধিকার পুনরুদ্ধার (Restitution of Conjugal Rights):

যদি স্ত্রী যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়া স্বামীর ঘর ছেড়ে চলে যান, তবে স্বামী তাকে ফিরিয়ে আনার জন্য আদালতে 'দাম্পত্য অধিকার পুনরুদ্ধার'-এর মামলা করতে পারেন। একে ইংরেজিতে Restitution of Conjugal Rights বলা হয়।

আদালত কখন পুনরুদ্ধারের আদেশ দেন:

- যদি প্রমাণিত হয় যে, স্ত্রী বিনা কারণে স্বামীর অবাধ্য হয়ে আলাদা থাকছেন।
- যদি স্বামী স্ত্রীর মহর পরিশোধ করে থাকেন এবং বসবাসের উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করেন।

আদালত কখন পুনরুদ্ধারের আদেশ দেন না (প্রত্যাখ্যান):

নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে আদালত স্বামীর আবেদন খারিজ করে দেন এবং স্ত্রীকে স্বামীর ঘরে ফিরতে বাধ্য করেন না:

- **মহর পরিশোধ না করলে:** স্বামী যদি 'তাৎক্ষণিক মহর' (Prompt Dower) পরিশোধ না করে থাকেন।
- **নিষ্ঠুরতা:** স্বামী যদি স্ত্রীর ওপর শারীরিক বা মানসিক নির্যাতন চালান।
- **মিথ্যা অপবাদ:** স্বামী যদি স্ত্রীর চরিত্রের ওপর মিথ্যা অপবাদ দেন।
- **শরিয়ত লঙ্ঘন:** স্বামী যদি শরিয়তবিরোধী কোনো কাজ করতে স্ত্রীকে বাধ্য করেন।
- **দ্বিতীয় বিবাহ:** ১৯৬১ সালের আইন লঙ্ঘন করে স্বামী যদি অনুমতি ছাড়া দ্বিতীয় বিবাহ করেন।

পার্থক্য (আইন ও ফিকহ):

বিষয়	ফিকহী বিধান	বাংলাদেশী আইন
ভরণ-পোষণ	নাফরমান (অবাধ্য) স্ত্রীর ভরণ-পোষণ বাতিল হয়ে যায়।	আদালত মানবিক কারণে অনেক সময় বিবাহ বলবৎ থাকা পর্যন্ত ভরণ-পোষণ মঞ্জুর করেন।
পুনরুদ্ধার	কাজীর মাধ্যমে স্ত্রীকে ফিরতে বাধ্য করা যায় (শর্তসাপেক্ষে)।	আদালত ডিক্রি দিতে পারে, কিন্তু স্ত্রীকে শারীরিকভাবে জোর করে ধরে এনে স্বামীর হাতে তুলে দেয় না (সম্পত্তি ক্রোক করতে পারে)।

উপসংহার:

বাংলাদেশী আইনে নারীর ভরণ-পোষণের অধিকারকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। স্বামী চাইলেই স্ত্রীকে বঞ্চিত করতে পারেন না। আবার স্ত্রী অন্যায়ভাবে দূরে সরে থাকলে, স্বামীকেও তার দাম্পত্য অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, তবে তা অবশ্যই স্ত্রীর নিরাপত্তা নিশ্চিত সাপেক্ষে।

প্রশ্ন-৩: মহর (Dower)-এর সংজ্ঞা, প্রকারভেদ (তাৎক্ষণিক ও বিলম্বিত) আলোচনা কর। বিবাহ বিচ্ছেদ বা স্বামীর মৃত্যুর পর মহরের বিধান কী?
ناقش تعريف المهر وأنواعه (المعجل والمؤجل) - وما هو حكم المهر بعد (الطلاق أو وفاة الزوج؟

ভূমিকা:

মহর হলো মুসলিম বিবাহের একটি অপরিহার্য অনুষঙ্গ। এটি নারীর প্রতি ইসলামের সম্মান এবং তার অর্থনৈতিক নিরাপত্তার প্রতীক। মহর কোনো উপহার বা যৌতুক নয়, বরং এটি স্ত্রীর অবশ্যপাওনা হক যা স্বামীকে আদায় করতেই হয়।

১. মহরের সংজ্ঞা (Ta'rif):

আভিধানিক সংজ্ঞা:

'মহর' (المهر) আরবি শব্দ। এর অর্থ হলো পুরস্কার, প্রতিদান বা খুশি মনে কোনো কিছু দেওয়া। কুরআনে একে 'সাদুকাত' (صدقات) বলা হয়েছে।

পারিভাষিক সংজ্ঞা:

হানাফি ফিকহ অনুযায়ী:
আরবি ইবারত: هُوَ الْمَالُ الَّذِي يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ لِلْمَرْأَةِ بِعَقْدِ النِّكَاحِ أَوْ بِالْوَطْءِ.
অর্থ: "মহর হলো সেই সম্পদ, যা বিবাহের চুক্তির কারণে বা সহবাসের কারণে স্বামীর ওপর স্ত্রীর জন্য আবশ্যক হয়ে পড়ে।"
অর্থাৎ, বিবাহের আকদ হওয়ার সাথে সাথেই স্ত্রী স্বামীর কাছে একটি নির্দিষ্ট অর্থের মালিকানা লাভ করে।

২. মহরের প্রকারভেদ (Classification):

আদায় বা পরিশোধের সময়ের ভিত্তিতে মহর দুই প্রকার:

ক. মহরে মু'আজ্জাল বা তাৎক্ষণিক মহর (Prompt Dower):

- **সংজ্ঞা:** মহরের যে অংশ চাওয়ামাত্র স্ত্রীকে পরিশোধ করতে হয়।
- **বিধান:** স্ত্রী দাবি করার সাথে সাথে স্বামী এটি দিতে বাধ্য। এটি পরিশোধ না করা পর্যন্ত স্ত্রী স্বামীর সাথে সহবাসে অসম্মতি জানাতে পারেন এবং স্বামীর বাড়িতে যেতে অস্বীকার করতে পারেন। বাংলাদেশী আইনে সাধারণত কাবিননামায় এটি নির্দিষ্ট করা থাকে (যেমন: উসুল)।

খ. মহরে মুওয়াজ্জাল বা বিলম্বিত মহর (Deferred Dower):

- **সংজ্ঞা:** মহরের যে অংশ সাথে সাথে পরিশোধ করতে হয় না, বরং ভবিষ্যতে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে বা ঘটনার প্রেক্ষিতে পরিশোধ করতে হয়।
- **বিধান:** এটি সাধারণত বিবাহ বিচ্ছেদ অথবা স্বামীর মৃত্যুর পর আদায়যোগ্য হয়। তবে স্বামী চাইলে আগেও দিতে পারেন।

৩. বিবাহ বিচ্ছেদ বা স্বামীর মৃত্যুর পর মহরের বিধান:

ক. বিবাহ বিচ্ছেদের পর (After Divorce):

- **সহবাসের পর:** যদি সহবাসের (বা নির্জনবাসের) পর তালাক হয়, তবে স্ত্রীকে **পূর্ণ মহর** পরিশোধ করতে হবে।

- **সহবাসের আগে:** যদি সহবাসের আগেই তালাক হয় এবং মহর ধার্য থাকে, তবে **অর্ধেক মহর** পরিশোধ করতে হবে। (আর ধার্য না থাকলে 'মুত'আ' বা ৩টি কাপড় দিতে হবে)।

খ. স্বামীর মৃত্যুর পর (After Death):

স্বামীর মৃত্যু হলে মহর একটি 'ঋণ' (Debt) হিসেবে গণ্য হয়।

- **উত্তরাধিকারের আগে পরিশোধ:** স্বামীর রেখে যাওয়া সম্পদ বণ্টন করার আগেই স্ত্রীর মহর পরিশোধ করতে হবে। এটি স্বামীর অন্যান্য ঋণের মতোই অগ্রাধিকার পাবে।
- **দখল বজায় রাখা:** মহর না পাওয়া পর্যন্ত বিধবা স্ত্রী স্বামীর সম্পত্তিতে তার দখল বজায় রাখার অধিকার রাখেন (Right of Retention)।

পার্থক্য (মু'আজ্জাল ও মুওয়াজ্জাল):

পার্থক্যের বিষয়	মহরে মু'আজ্জাল (তাৎক্ষণিক)	মহরে মুওয়াজ্জাল (বিলম্বিত)
১. অর্থ	'আজিলা' বা জলদি আদায়যোগ্য।	'আজল' বা দেরিতে আদায়যোগ্য।
২. দাবি	স্ত্রী যেকোনো সময় দাবি করতে পারে।	সাধারণত বিচ্ছেদ বা মৃত্যুর পর দাবি করা যায়।
৩. অধিকার	না দিলে স্ত্রী দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপনে বাধা দিতে পারে।	এর জন্য স্ত্রী নিজেকে স্বামীর কাছ থেকে বিরত রাখতে পারে না।

উপসংহার:

মহর নারীর একটি অবিচ্ছেদ্য অধিকার। অনেক সময় সমাজে মহরকে কেবল কাগুজে দলিল মনে করা হয়, যা শরিয়ত ও আইনের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ ভুল। আইন অনুযায়ী, মহর মাফ করা কঠিন এবং স্বামী মারা গেলেও তার সম্পদ থেকে এটি আদায় করা বাধ্যতামূলক।

প্রশ্ন-৪: মুসলিম পারিবারিক আইন অনুযায়ী তালাক প্রদানের প্রক্রিয়া ও শর্তাবলি সবিস্তারে আলোচনা কর। এ প্রক্রিয়ায় সালিশি পরিষদের ভূমিকা কী?
ناقش بالتفصيل إجراءات الطلاق وشروطه بموجب قانون الأسرة المسلمة - وما هو دور مجلس التحكيم في هذه العملية؟)

ভূমিকা:

ইসলামি শরিয়তে তালাক প্রদানের ক্ষমতা স্বামীর হাতে ন্যস্ত থাকলেও, এর অপব্যবহার রোধে এবং পারিবারিক ভাঙন ঠেকাতে 'মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ, ১৯৬১' (Muslim Family Laws Ordinance, 1961)-তে তালাক কার্যকর করার সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া বা প্রসিডিউর নির্ধারণ করা হয়েছে। বাংলাদেশে এই আইন অনুযায়ী তালাক রেজিস্ট্রি ও কার্যকর করতে হয়।

১. তালাক প্রদানের আইনি প্রক্রিয়া (Procedure under MFLO 1961):

উক্ত অধ্যাদেশের ৭ ধারায় তালাক প্রদানের নিম্নোক্ত পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে:

ক. তালাক উচ্চারণ ও নোটিশ প্রদান (Notice):

স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার পর (মৌখিকভাবে বা লিখিতভাবে), যথাশীঘ্র সম্ভব স্থানীয় 'চেয়ারম্যান'-কে লিখিতভাবে নোটিশ প্রদান করবেন এবং সেই নোটিশের একটি কপি স্ত্রীকে পাঠাবেন।

- **শাস্তি:** যদি কেউ নোটিশ না পাঠান, তবে ৭(২) ধারা অনুযায়ী তাকে **১ বছর পর্যন্ত বিনাশ্রম কারাদণ্ড** বা **১০,০০০ টাকা জরিমানা** বা **উভয় দণ্ড** দেওয়া হবে।

খ. ৯০ দিন সময় অতিবাহিত হওয়া (Waiting Period):

নোটিশ দেওয়ার সাথে সাথেই তালাক কার্যকর হয় না। চেয়ারম্যানের কাছে নোটিশ পৌঁছানোর তারিখ থেকে ৯০ দিন (তিন মাস) অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত তালাক বলবৎ হবে না। এই সময়কালকে আইনে ইদ্দত বা সমঝোতার সময় হিসেবে গণ্য করা হয়।

গ. গর্ভাবস্থার বিধান:

যদি তালাক প্রদানের সময় স্ত্রী গর্ভবতী থাকেন, তবে ৯০ দিন বা সন্তান প্রসব হওয়া—এই দুটির মধ্যে যে সময়টি দীর্ঘতর, সেই সময় পার হওয়ার পর তালাক কার্যকর হবে।

২. সালিশি পরিষদের ভূমিকা (Role of Arbitration Council):

তালাক নোটিশ পাওয়ার পর চেয়ারম্যানের প্রধান দায়িত্ব হলো 'সালিশি পরিষদ' গঠন করা। এর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ:

ক. পরিষদ গঠন (Constitution):

চেয়ারম্যান নোটিশ পাওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে স্বামী ও স্ত্রী উভয় পক্ষকে তাদের প্রতিনিধি মনোনয়ন করতে বলবেন। চেয়ারম্যান এবং উভয় পক্ষের প্রতিনিধি নিয়ে 'সালিশি পরিষদ' গঠিত হবে।

খ. সমঝোতার প্রচেষ্টা (Reconciliation):

এই পরিষদের মূল কাজ হলো ৯০ দিনের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মিটমাট বা আপস-মীমাংসা করার চেষ্টা করা। পরিষদ উভয়ের কথা শুনবে এবং সংসার টিকিয়ে রাখার সর্বাত্মক চেষ্টা করবে।

গ. ফলাফল:

- **সমঝোতা সফল হলে:** স্বামী তার তালাক প্রত্যাহার করে নেবেন এবং তারা পুনরায় সংসার করবেন। এ ক্ষেত্রে তালাক কার্যকর হবে না।
- **সমঝোতা ব্যর্থ হলে:** ৯০ দিন পার হওয়ার পর তালাকটি আইনত কার্যকর (Effective) হয়ে যাবে এবং তখন তালাক রেজিস্ট্রেশন করতে হবে।

৩. ফিকহ ও আইনের তুলনামূলক বিশ্লেষণ (Comparison):

বিষয়	হানাফি ফিকহ	মুসলিম পারিবারিক আইন ১৯৬১
১. কার্যকারিতা	তালাক শব্দ উচ্চারণের সাথে সাথেই কার্যকর হয়।	নোটিশ প্রদানের ৯০ দিন পর কার্যকর হয়।

২. প্রত্যাহার	বাইন তালাক হলে প্রত্যাহার করা যায় না (নতুন বিয়ে লাগে)।	৯০ দিনের মধ্যে যেকোনো তালাক (এমনকি বাইন হলেও) প্রত্যাহার করা যায় বলে আইনে ধরা হয়।
৩. নোটিশ	নোটিশ দেওয়া জরুরি নয়, সাক্ষী রাখাই যথেষ্ট।	চেয়ারম্যান ও স্ত্রীকে নোটিশ দেওয়া বাধ্যতামূলক।

উপসংহার:

মুসলিম পারিবারিক আইনে তালাকের প্রক্রিয়াটি মূলত তালাক প্রদানে ধীরস্থিরতা এবং সমঝোতার সুযোগ সৃষ্টির জন্য তৈরি করা হয়েছে। সালিশি পরিষদের মাধ্যমে অসংখ্য ভেঙে যাওয়া সংসার জোড়া লাগানো সম্ভব হয়, যা শরিয়তের উদ্দেশ্যের (ইসলাহ) সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

প্রশ্ন-৫: সন্তানের বংশ পরিচয় (Paternity) ও যেনার (Illegitimacy) বৈধতা ও স্বীকৃতির ক্ষেত্রে বাংলাদেশী আইনে মুসলিম ফিকহের মূলনীতিগুলো কীভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে?

كيف تم تطبيق مبادئ الفقه الإسلامي في القانون البنغلاديشي بخصوص (نسب الأطفال وشرعية الزنى والاعتراف به؟)

ভূমিকা:

সন্তানের বংশ পরিচয় বা 'নসব' (نسب) ইসলামি শরিয়ত ও মুসলিম আইনের একটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিষয়। এর মাধ্যমে সন্তানের উত্তরাধিকার, ভরণ-পোষণ ও সামাজিক মর্যাদা নির্ধারিত হয়। বাংলাদেশী আদালতগুলো এ ক্ষেত্রে 'সাক্ষ্য আইন ১৮৭২' এবং 'মুসলিম ফিকহ'-এর সমন্বয়ে রায় প্রদান করে থাকে।

১. মুসলিম ফিকহের মূলনীতি (Principles of Fiqh):

হানাফি ফিকহ অনুযায়ী সন্তানের বৈধতা বা নসব প্রমাণের মূলনীতি হলো:

হাদিস: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

অর্থ: "সন্তান বিছানার (অর্থাৎ যার সাথে বৈধ বিবাহ হয়েছে তার), আর ব্যভিচারীর জন্য রয়েছে পাথর (শাস্তি/বঞ্চনা)।"

মূলনীতিসমূহ:

- **ন্যূনতম গর্ভকাল:** বিয়ের পর অন্তত **৬ মাস (চন্দ্র মাস)** অতিক্রান্ত হওয়ার পর সন্তান জন্ম নিলে তা বৈধ বলে গণ্য হবে।
- **সর্বোচ্চ গর্ভকাল:** হানাফি মতে ২ বছর। অর্থাৎ তালাক বা মৃত্যুর পর ২ বছরের মধ্যে সন্তান হলে তা সাবেক স্বামীর সন্তান হিসেবে গণ্য হবে (যদি মা পুনর্বিবাহ না করে)।

২. বাংলাদেশী আইনের প্রয়োগ (Bangladeshi Law Application):

বাংলাদেশে 'সাক্ষ্য আইন ১৮৭২'-এর ১১২ ধারা এবং মুসলিম আইনের নীতির মধ্যে কিছুটা সাংঘর্ষিক অবস্থান রয়েছে, তবে আদালতগুলো একটি সমন্বয় করে থাকে।

ক. সাক্ষ্য আইন ১৮৭২, ধারা ১১২:

এই ধারায় বলা হয়েছে, বিবাহ বলবৎ থাকাকালে অথবা বিবাহ বিচ্ছেদের পর ২৮০ দিনের মধ্যে যদি কোনো সন্তান জন্মগ্রহণ করে এবং মা অবিবাহিত থাকে, তবে সেই সন্তান বৈধ বলে চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত (Conclusive Proof) হবে।

- **শর্ত:** যদি প্রমাণ করা না যায় যে, ওই সময়ে স্বামী-স্ত্রীর দৈহিক মিলনের কোনো সুযোগই ছিল না।

খ. ফিকহ ও আইনের সমন্বয়:

বাংলাদেশী আদালত সাধারণত ১১২ ধারা অনুসরণ করে, কারণ এটি বিধিবদ্ধ আইন। তবে মুসলিম উত্তরাধিকার বা ধর্মীয় অধিকারের ক্ষেত্রে অনেক সময় ফিকহের নীতি দেখা হয়।

- **পার্থক্য:** ফিকহে সর্বোচ্চ সময় ২ বছর, কিন্তু আইনে ২৮০ দিন। আইনে ২৮০ দিনের বেশি হলে সন্তান অবৈধ হতে পারে, যা ফিকহের সাথে সাংঘর্ষিক। তবে বাস্তবে ২৮০ দিনের বেশি গর্ভধারণ চিকিৎসাবিজ্ঞানে বিরল হওয়ায় আইনের বিধানই বেশি প্রয়োগ হয়।

৩. অবৈধতা বা জিনা (Illegitimacy):

মুসলিম আইন ও বাংলাদেশী আইনে 'জিনা' বা ব্যভিচারের মাধ্যমে জন্ম নেওয়া সন্তানের কোনো বংশ পরিচয় পিতার সাথে সম্পৃক্ত হয় না।

- **অধিকার:** অবৈধ সন্তান পিতার ওয়ারিশ হয় না, তবে মায়ের ওয়ারিশ হয়।
- **স্বীকৃতি (Iqrar):** যদি বংশ পরিচয় অনিশ্চিত থাকে (জিনা প্রমাণিত না হয়), আর পিতা যদি 'ইকরার' বা স্বীকারোক্তি দেয় যে "এটা আমার সন্তান", তবে আইন ও ফিকহ উভয় মতেই সন্তানটি বৈধ বলে গণ্য হবে। একে 'Acknowledgment of Paternity' বলা হয়।

উপসংহার:

সন্তানের বৈধতার ক্ষেত্রে বাংলাদেশী আইন ও ইসলামি শরিয়তের মূল লক্ষ্য একই—সন্তানকে অপবাদ থেকে রক্ষা করা। আদালত সবসময় সন্তানের বৈধতার পক্ষে রায় দেওয়ার চেষ্টা করে, যতক্ষণ না অবৈধতা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়।

প্রশ্ন-৬: মুসলিম পারিবারিক আইনে সম্পত্তির অভিভাবকত্ব (Guardianship of Property) সংক্রান্ত বিধানাবলি কী কী? একজন অভিভাবকের অধিকার ও কর্তব্য আলোচনা কর।
(ما هي الأحكام المتعلقة بالولاية على الأموال في القانون الأسرة المسلمة؟ وناقش حقوق الولي وواجباته)

ভূমিকা:

একজন নাবালক (Minor) নিজের সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ বা পরিচালনা করতে পারে না। তাই তার সম্পত্তি রক্ষার জন্য 'অভিভাবকত্ব ও প্রতিপাল্য আইন ১৮৯০' এবং মুসলিম ফিকহের আলোকে অভিভাবক নিযুক্ত করা হয়। ফিকহের পরিভাষায় একে 'বেলায়াতুল মাল' (ولاية المال) বলা হয়।

১. সম্পত্তির অভিভাবকের শ্রেণিবিভাগ (Classification):

মুসলিম আইনে সম্পত্তির অভিভাবক তিন ধরনের হতে পারে:

ক. আইনগত অভিভাবক (Legal Guardian):

এরা শরিয়ত ও আইন অনুযায়ী জন্মগতভাবেই অভিভাবক। ক্রমধারা নিম্নরূপ:

১. পিতা (বাবা)।

২. পিতা কর্তৃক নিযুক্ত ওসি (Executor)।

৩. দাদা (বাবার বাবা)।

৪. দাদা কর্তৃক নিযুক্ত ওসি।

- **নোট:** মা, ভাই বা চাচা আইনগত অভিভাবক নন।

খ. আদালত কর্তৃক নিযুক্ত অভিভাবক (Certified Guardian):

আইনগত অভিভাবক না থাকলে আদালত (District Judge) যাকে নিয়োগ দেন।

গ. কার্যত অভিভাবক (De-facto Guardian):

যিনি স্বেচ্ছায় নাবালকের সম্পত্তি দেখাশোনা করেন (যেমন: মা, মামা, ভাই)। এদের ক্ষমতা খুবই সীমিত।

২. অভিভাবকের অধিকার ও ক্ষমতা (Rights & Powers):

ক. স্থাবর সম্পত্তি (জমি-জমা) হস্তান্তর:

আইনগত অভিভাবক (পিতা/দাদা) নাবালকের স্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করতে পারেন, তবে শুধুমাত্র নিচের জরুরি প্রয়োজনে:

১. ক্রেতা যদি দ্বিগুণ মূল্য দেয়।

২. নাবালকের ভরণ-পোষণের জন্য অন্য কোনো উপায় না থাকলে।

৩. মৃত ব্যক্তির (নাবালকের উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া) ঋণ পরিশোধের জন্য।

৪. সম্পত্তিটি নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকলে।

- **সতর্কতা:** আদালত কর্তৃক নিযুক্ত অভিভাবক আদালতের অনুমতি ছাড়া স্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করতে পারেন না। আর 'কার্যত অভিভাবক' (যেমন মা) কোনোভাবেই স্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করতে পারেন না, করলে তা বাতিল (Void) হবে।

খ. অস্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর:

নাবালকের প্রয়োজনে অভিভাবক অস্থাবর সম্পত্তি (টাকা, সোনা, আসবাবপত্র) বিক্রি বা বন্ধক রাখতে পারেন।

৩. অভিভাবকের কর্তব্য (Duties):

১৮৯০ সালের আইন অনুযায়ী অভিভাবকের প্রধান কর্তব্যগুলো হলো:

- **সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ:** আমানতদারিতার সাথে সম্পত্তি দেখাশোনা করা। নিজের লাভের জন্য ব্যবহার না করা।
- **হিসাব প্রদান:** সম্পত্তির আয়-ব্যয়ের সঠিক হিসাব রাখা এবং আদালতের নির্দেশমতো তা দাখিল করা।
- **শিক্ষা ও চিকিৎসা:** সম্পত্তির আয় থেকে নাবালকের যথাযথ শিক্ষা, চিকিৎসা ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা।
- **সম্পত্তি হস্তান্তর না করা:** আদালতের অনুমতি বা শরিয়তসম্মত কারণ ছাড়া সম্পত্তি হাতছাড়া না করা।

অভিভাবকত্ব ও জিম্মাদারির পার্থক্য (Table):

বিষয়	জিম্মাদারি (Hizanat)	সম্পত্তির অভিভাবকত্ব (Walayah)
১. মূল ব্যক্তি	মা (নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত)।	বাবা বা দাদা।
২. দায়িত্ব	শরীর ও মনের যত্ন নেওয়া।	সম্পত্তি ও অর্থের যত্ন নেওয়া।
৩. মায়ের ক্ষমতা	মা সম্পত্তি বিক্রি করতে পারেন না।	মা শুধু জিম্মাদার, অভিভাবক নন।

উপসংহার:

নাবালকের সম্পত্তি একটি পবিত্র আমানত। আল্লাহ তায়ালা এতিম বা নাবালকের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন (সূরা নিসা: ১০)। বাংলাদেশী আইনেও অভিভাবকের দায়িত্ব ও ক্ষমতার ওপর কঠোর নজরদারি রাখা হয়েছে, যাতে নাবালকের স্বার্থ ক্ষুণ্ন না হয়।

প্রশ্ন-৭: আত্মীয়দের ভরণ-পোষণ (Maintenance of Relatives) সম্পর্কে বাংলাদেশী আইনে কী বিধান রয়েছে? কোন ধরনের আত্মীয়দের জন্য ভরণ-পোষণ ওয়াজিব?

(ما هو الحكم في القانون البنغلاديشي بخصوص نفقة الأقارب؟ وما هي أنواع الأقارب التي تجب عليهم النفقة؟)

ভূমিকা:

ইসলামি সমাজব্যবস্থায় পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আত্মীয়দের ভরণ-পোষণ বা 'নাফাকাতুল আকারিব' (نَفَقَةُ الْأَقَارِبِ) একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান। ইসলামে কেবল স্ত্রী-সন্তান নয়, বরং অক্ষম ও অভাবী আত্মীয়দের দায়িত্ব নেওয়ার জন্যও সামর্থ্যবান ব্যক্তিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশী আইনেও শরিয়তের এই বিধানগুলোকে বিভিন্নভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

১. ভরণ-পোষণের সংজ্ঞা (Ta'rif):

আভিধানিক অর্থ: 'নাফাকাহ' বা ভরণ-পোষণ অর্থ ব্যয় করা।

পারিভাষিক অর্থ: কোনো ব্যক্তির বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষার খরচ বহন করাকে ভরণ-পোষণ বলে।

২. যাদের ভরণ-পোষণ ওয়াজিব (Entitled Relatives):

হানাফি ফিকহ ও মুসলিম আইন অনুযায়ী আত্মীয়দের ভরণ-পোষণকে ৩টি স্তরে ভাগ করা হয়েছে:

ক. স্ত্রী ও সন্তান (Wife and Children):

- **স্ত্রী:** স্বামীর আর্থিক অবস্থা যা-ই হোক না কেন, স্ত্রীর ভরণ-পোষণ দেওয়া স্বামীর ওপর সর্বদা **ফরজ**।
- **পুত্র সন্তান:** বালেগ হওয়ার আগ পর্যন্ত।
- **কন্যা সন্তান:** বিবাহ হওয়ার আগ পর্যন্ত।
- **সাবালক সন্তান:** যদি সন্তান প্রতিবন্ধী, পাগল বা উপার্জনে অক্ষম হয়, তবে আজীবন তার ভরণ-পোষণ বাবার ওপর ওয়াজিব।

খ. পিতামাতা ও দাদা-দাদি (Parents & Grandparents):

পিতামাতা যদি অভাবী হন এবং সন্তান যদি স্বচ্ছল (নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক বা উপার্জনক্ষম) হয়, তবে পিতামাতার ভরণ-পোষণ দেওয়া সন্তানের ওপর ওয়াজিব। পিতামাতা ভিন্ন ধর্মের হলেও এই বিধান কার্যকর থাকবে।

গ. অন্যান্য আত্মীয় (Collateral Relatives):

যাদের সাথে বিবাহ হারাম (মাহরাম আত্মীয়), তারা যদি চরম অভাবী, শিশু বা পাগল হয়, তবে স্বচ্ছল আত্মীয়ের ওপর তাদের ভরণ-পোষণ ওয়াজিব। যেমন: ভাই, বোন, চাচা, ফুফু। (তবে এটি উত্তরাধিকারের হারের ওপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হয়)।

৩. বাংলাদেশী আইনে আত্মীয়দের ভরণ-পোষণের বিধান:

বাংলাদেশে আত্মীয়দের ভরণ-পোষণ আদায়ের জন্য মূলত দুটি আইন প্রচলিত:

(১) মুসলিম পারিবারিক আইন ও পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ ১৯৮৫:

এই আইনের মাধ্যমে স্ত্রী ও নাবালক সন্তানরা পারিবারিক আদালতে মামলা করে সহজেই ভরণ-পোষণ আদায় করতে পারে। কিন্তু পিতামাতা বা অন্যান্য আত্মীয়ের জন্য এই আইনে স্পষ্ট প্রতিকার পাওয়া কঠিন ছিল।

(২) পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ আইন, ২০১৩:

পিতামাতার অধিকার নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশ সরকার ২০১৩ সালে একটি যুগান্তকারী আইন পাস করে। এই আইনের প্রধান বিধানগুলো হলো:

- **বাধ্যতামূলক দায়িত্ব:** প্রত্যেক সন্তানকে তার পিতামাতার ভরণ-পোষণ নিশ্চিত করতে হবে।
- **বাসস্থান:** পিতামাতাকে জোর করে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠানো যাবে না। সন্তানের সাথেই রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।
- **উপার্জন থেকে ব্যয়:** সন্তান তার আয়ের একটা নির্দিষ্ট অংশ পিতামাতার জন্য ব্যয় করতে বাধ্য থাকবে।
- **শাস্তি:** যদি কোনো সন্তান এই আইন লঙ্ঘন করে বা পিতামাতাকে ভরণ-পোষণ না দেয়, তবে তাকে **১ লক্ষ টাকা জরিমানা** অনাদায়ে **৩ মাসের কারাদণ্ড** ভোগ করতে হবে।
- **আপসযোগ্য ও জামিনযোগ্য:** এই অপরাধটি আপসযোগ্য, অর্থাৎ পিতামাতা চাইলে মাফ করে দিতে পারেন।

৪. ফিকহী শর্তাবলি (Conditions in Fiqh):

আত্মীয়দের (স্ত্রী ছাড়া অন্যদের) ভরণ-পোষণ ওয়াজিব হওয়ার জন্য ফিকহী শর্ত হলো:

১. আত্মীয়কে গরিব বা অভাবী হতে হবে।

২. দায়িত্ব পালনকারীকে স্বচ্ছল বা উপার্জনক্ষম হতে হবে।

৩. আত্মীয়ের সাথে রক্তের সম্পর্ক (রাহিম) থাকতে হবে।

উপসংহার:

আত্মীয়দের ভরণ-পোষণ কেবল দয়া-দাক্ষিণ্য নয়, বরং এটি একটি আইনি ও ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা। বাংলাদেশী আইনে বিশেষ করে 'পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ আইন ২০১৩' প্রণয়নের মাধ্যমে ইসলামি শরিয়তের সেই মহান দায়িত্ববোধকেই আইনি রূপ দেওয়া হয়েছে, যাতে বৃদ্ধ বয়সে কেউ অসহায় না হয়ে পড়ে।

প্রশ্ন-৮: বিবাহের ক্ষেত্রে শরীয়ত অনুমোদিত শর্তাবলি কী কী? ফাসিদ বা বাতিল শর্তের কারণে বিবাহের হুকুম কী হয়? ফিকহ ও আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ কর।

ما هي الشروط المباحة شرعا في النكاح؟ وماذا يكون حكم النكاح بسبب الشروط الفاسدة أو الباطلة؟ حلل من منظور الفقه والقانون)

ভূমিকা:

বিবাহ একটি দেওয়ানি চুক্তি (Civil Contract)। যেকোনো চুক্তির মতো বিবাহেও পক্ষগণ নিজেদের সুবিধা অনুযায়ী কিছু শর্ত আরোপ করতে পারেন। তবে শরিয়ত ও আইনে সব ধরনের শর্ত গ্রহণযোগ্য নয়। কিছু শর্ত বৈধ, কিছু অবৈধ এবং কিছু শর্ত বিবাহের মূল উদ্দেশ্যের সাথে সাংঘর্ষিক। হানাফি ফিকহ ও আইনের দৃষ্টিতে শর্তযুক্ত বিবাহের বিধান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

১. বিবাহের শর্তাবলির প্রকারভেদ (Types of Conditions):

শর্তের বৈধতা ও প্রভাবের ওপর ভিত্তি করে বিবাহের শর্তগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়:

ক. বৈধ বা সহীহ শর্ত (Legal/Valid Conditions):

যেসব শর্ত বিবাহের মূল উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ অথবা যা পালনে শরিয়তে কোনো বাধা নেই। এগুলো পালন করা স্বামীর ওপর ওয়াজিব।

- **উদাহরণ:**
    - স্ত্রী শর্ত দিল, "আমার মহর নগদে পরিশোধ করতে হবে।"
    - "আমাকে নিয়ে আমার শহরেই বসবাস করতে হবে।"
    - "তুমি দ্বিতীয় বিবাহ করতে পারবে না" (কাবিননামার ১৮ নং কলাম অনুযায়ী তালাকের ক্ষমতা বা তাফভীজ নেওয়া)।
- **হুকুম:** এই শর্তগুলো বৈধ এবং পালনীয়। ভঙ্গ করলে স্ত্রী আদালতের মাধ্যমে প্রতিকার চাইতে পারে বা তালাকের ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে।

খ. বাতিল শর্ত (Void Conditions):

যেসব শর্ত বিবাহের মূল উদ্দেশ্যের (যেমন: সহবাস, বংশবৃদ্ধি, মহর) সম্পূর্ণ বিরোধী।

- **উদাহরণ:**
    - "আমি তোমাকে বিয়ে করব এই শর্তে যে, তুমি কোনো মহর পাবে না।"
    - "বিয়ে হবে, কিন্তু আমরা স্বামী-স্ত্রী হিসেবে মেলামেশা করব না।"
    - "তোমার ভরণ-পোষণ আমি দেব না।"
- **হুকুম (হানাফি মত):** এই ধরনের শর্তগুলো বাতিল (Null and Void) বলে গণ্য হবে, কিন্তু **বিবাহ সহীহ বা শুদ্ধ হয়ে যাবে**। অর্থাৎ, শর্তটি মানা জরুরি নয়, স্বামী মহর ও ভরণ-পোষণ দিতে বাধ্য থাকবে।

গ. ফাসিদ শর্ত বা শর্তে ফাসিদ (Irregular Conditions):

এমন শর্ত যা বিবাহের মূল উদ্দেশ্যের বিরোধী নয়, কিন্তু শরিয়ত একে অনুমোদন করে না বা এতে এক পক্ষের অযৌক্তিক লাভ হয়।

- **উদাহরণ:** বিয়ের সময় শর্ত দেওয়া হলো যে, কনেকে বা তার বাবাকে আলাদা ১০ লক্ষ টাকা যৌতুক দিতে হবে।

২. ফাসিদ বা বাতিল শর্তের কারণে বিবাহের হুকুম (Effects on Marriage):

ফিকহী দৃষ্টিকোণ (হানাফি):

হানাফি মাজহাবের একটি বিশেষ মূলনীতি হলো:

আরবি ইবারত: النِّكَاحُ لَا يَبْطُلُ بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ

অর্থ: "ফাসিদ বা অবৈধ শর্তের কারণে বিবাহ বাতিল হয় না।"

- **ব্যাখ্যা:** অন্যান্য বেচাকেনার চুক্তিতে ফাসিদ শর্ত থাকলে পুরো চুক্তিই বাতিল হয়ে যায়। কিন্তু বিবাহের ক্ষেত্রে, যদি শর্তটি অবৈধ হয়, তবে **শর্তটি বাতিল হয়ে যাবে, কিন্তু বিবাহ বলবৎ ও শুদ্ধ থাকবে**।

- **উদাহরণ:** কেউ যদি শর্ত দেয় "বিয়ে করব কিন্তু মহর দেব না"—তবে শরিয়তের দৃষ্টিতে বিয়ে হয়ে যাবে এবং স্ত্রীকে 'মহরে মিসল' (স্বাভাবিক মহর) দেওয়া ওয়াজিব হবে। শর্তটি ধর্তব্য হবে না।

ব্যতিক্রম (মুত'আ বিবাহ):

যদি শর্ত এমন হয় যা বিবাহের স্থায়িত্বকে নষ্ট করে, যেমন—"আমি তোমাকে ১ মাসের জন্য বিয়ে করলাম" (মুত'আ বা সাময়িক বিবাহ)।

- **হুকুম:** আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মতে, সময়ের শর্তযুক্ত এই বিবাহ **সম্পূর্ণ বাতিল (Batil)**। এটি জিনা বা ব্যভিচার হিসেবে গণ্য হবে।

৩. আইনি দৃষ্টিকোণ (Legal Perspective):

বাংলাদেশী আইনে 'কাবিননামা' বা নিকাহনামায় শর্ত লেখার সুযোগ রয়েছে।

- **ধারা ১৮ (কাবিননামা):** এখানে স্বামী-স্ত্রী পারস্পরিক সম্মতিতে বিশেষ শর্তাবলী লিখতে পারেন।

- **শর্ত লঙ্ঘনের ফলাফল:** যদি স্বামী কোনো বৈধ শর্ত (যেমন: ঢাকায় বসবাস করা) লঙ্ঘন করে, তবে স্ত্রী 'বিবাহ বিচ্ছেদ আইন ১৯৩৯'-এর ২(৮)(খ) ধারা অনুযায়ী আদালতে বিবাহ বিচ্ছেদের (Dissolution of Marriage) আবেদন করতে পারেন।

- **যৌতুক:** যৌতুক বা পণ আদান-প্রদানের শর্ত আইনে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ, যদিও এর কারণে বিয়ে বাতিল হয় না।

উপসংহার:

ইসলামি শরিয়ত বিবাহের মাধ্যমে সৃষ্ট বন্ধনকে এতটাই গুরুত্ব দিয়েছে যে, ছোটখাটো ভুল বা অবৈধ শর্তের কারণে বিবাহ ভেঙে দেওয়া হয় না। বরং শর্তটিকে বাতিল করে বিবাহকে টিকিয়ে রাখা হয়। তবে তালাকের ক্ষমতা বা

বসবাসের স্থানের মতো বৈধ শর্তগুলো পালন করা আইন ও ধর্ম উভয় দিক থেকেই স্বামীর জন্য আবশ্যক।

প্রশ্ন-৯: ফিকহী দৃষ্টিতে 'তালাক' ও 'ফাসখ'-এর মধ্যকার পার্থক্যগুলো উদাহরণসহ বিশ্লেষণ কর। এগুলো আইনে কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে?
(حلل الفروق بين "الطلاق" و "الفسخ" من الناحية الفقهية مع الأمثلة - وكيف انعكست هذه الفروق في القانون؟)

ভূমিকা:

বিবাহ বিচ্ছেদ বা দাম্পত্য সম্পর্ক অবসানের দুটি প্রধান পদ্ধতি হলো 'তালাক' এবং 'ফাসখ'। যদিও উভয়ের চূড়ান্ত ফলাফল একই (স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদ), কিন্তু শরিয়ত ও আইনের দৃষ্টিতে এদের উৎস, ক্ষমতা প্রয়োগ এবং ফলাফলে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। এই পার্থক্যগুলো বোঝা একজন আইনজ্ঞ বা ফকিহর জন্য অত্যন্ত জরুরি।

১. সংজ্ঞা (Definition):

- **তালাক (Talaq):** তালাক অর্থ বন্ধন খুলে দেওয়া। এটি স্বামীর একছত্র অধিকার। স্বামী নির্দিষ্ট শব্দ প্রয়োগ করে বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করলে তাকে তালাক বলে।
- **ফাসখ (Faskh):** ফাসখ অর্থ বাতিল বা রহিত করা (Cancellation)। আদালতের রায় বা শরিয়তের বিধানের কারণে বিবাহের চুক্তিটি গোড়া থেকে বাতিল বা ভঙ্গ হয়ে যাওয়াকে ফাসখ বলে।

২. ফিকহী দৃষ্টিতে পার্থক্যসমূহ (Differences in Fiqh):

শিক্ষার্থীদের বোঝার সুবিধার্থে পার্থক্যগুলো ছক আকারে ও বিশ্লেষণসহ তুলে ধরা হলো:

পার্থক্যের বিষয়	তালাক (الطلاق)	ফাসখ (الفسخ)
১. ক্ষমতা প্রয়োগকারী	এটি মূলত **স্বামীর ক্ষমতা**। স্বামী নিজে এটি প্রয়োগ করেন।	এটি **কাজী বা আদালতের ক্ষমতা**। বিচারকের রায় ছাড়া ফাসখ হয় না (মুতারা'আত ছাড়া)।
২. কারণ (Cause)	তালাকের জন্য কোনো বিশেষ কারণ বা দোষ থাকা জরুরি নয়।	ফাসখের জন্য অবশ্যই সুনির্দিষ্ট **শরিয়তসম্মত কারণ** (যেমন: স্বামীর অক্ষমতা, নিখোঁজ হওয়া) থাকতে হবে।
৩. মহর (Mahr)	সহবাসের আগে তালাক দিলে **অর্ধেক মহর** দিতে হয়।	কোনো দোষের কারণে (যেমন: প্রতারণা) সহবাসের আগে ফাসখ হলে সাধারণত **মহর দিতে হয় না**।
৪. তালাকের সংখ্যা	তালাক দিলে তালাকের সংখ্যা কমে যায় (৩টি থেকে ১টি কমে)।	ফাসখের কারণে **তালাকের সংখ্যা কমে না**। পুনরায় বিয়ে করলে আবার ৩টি তালাকের মালিকানা বহাল থাকে।
৫. ধরণ	তালাক রাজয়ী (ফেরতযোগ্য) বা বাইন হতে পারে।	ফাসখ সর্বদা **'বাইনে সুগরা'** (ছোট বিচ্ছেদ) হয়। অর্থাৎ সাথে সাথে বিবাহ ভেঙে যায়।

উদাহরণ:

- **তালাক:** স্বামী রাগের মাথায় স্ত্রীকে বলল, "তোমাকে তালাক দিলাম"। এটি তালাক। ইদ্দতের মধ্যে স্বামী তাকে ফিরিয়ে নিতে পারবে।
- **ফাসখ:** স্ত্রী আদালতে প্রমাণ করল যে বিয়ের সময় স্বামী পাগল ছিল। আদালত তাদের বিয়ে বিচ্ছেদ করে দিল। এটি ফাসখ। স্বামী সুস্থ হলেও স্ত্রীকে আর সরাসরি ফিরিয়ে নিতে পারবে না, নতুন বিয়ে করতে হবে।

৩. আইনে প্রতিফলন (Reflection in Law):

বাংলাদেশে প্রচলিত মুসলিম পারিবারিক আইনে এই পার্থক্যগুলো স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে, বিশেষ করে 'মুসলিম বিবাহ বিচ্ছেদ আইন ১৯৩৯' (The Dissolution of Muslim Marriages Act, 1939)-এর মাধ্যমে।

- **তালাকের প্রতিফলন:** ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশের ৭ ধারায় স্বামীর তালাক দেওয়ার ক্ষমতাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে (যদিও কিছু পদ্ধতিগত বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে)।
- **ফাসখের প্রতিফলন:** ১৯৩৯ সালের আইনের ২ ধারায় স্ত্রীকে আদালতের মাধ্যমে বিবাহ বিচ্ছেদ বা ফাসখ চাওয়ার অধিকার দেওয়া হয়েছে। এই আইনের অধীনে আদালত যে ডিক্রি দেয়, তা মূলত শরিয়তের 'ফাসখ'-এরই আইনি রূপ।
    - **কারণসমূহ:** স্বামী ৪ বছর নিখোঁজ থাকা, ২ বছর ভরণ-পোষণ না দেওয়া, ৭ বছর কারাদণ্ড হওয়া, পুরুষত্বহীনতা, নিষ্ঠুরতা ইত্যাদি।
- **খুলার অবস্থান:** আইনে খুলা (স্ত্রীর প্রস্তাবে বিচ্ছেদ)-কে ফাসখ ও তালাকের মাঝামাঝি একটি অবস্থান দেওয়া হয়েছে, যেখানে আদালতের ভূমিকাও থাকতে পারে আবার পারস্পরিক সম্মতিতেও হতে পারে।

উপসংহার:

'তালাক' হলো স্বামীর হাতে থাকা একটি অস্ত্র, যা তিনি ইচ্ছামতো ব্যবহার করতে পারেন (শরিয়তের গণ্ডিতে)। আর 'ফাসখ' হলো স্ত্রীর হাতে থাকা ঢাল বা রক্ষাকবচ, যা তিনি আদালতের মাধ্যমে ব্যবহার করে স্বামীর জুলুম থেকে মুক্তি পেতে পারেন। বাংলাদেশী আইন শরিয়তের এই ভারসাম্যকে বজায় রেখেই নারীদের ফাসখ চাওয়ার পথকে ১৯৩৯ সালের আইনের মাধ্যমে সুগম করেছে।

প্রশ্ন-১০: মুসলিম পরিবার অধ্যাদেশ ১৯৬১-এর উদ্দেশ্য ও প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা কর। এটি মুসলিম পারিবারিক আইনে কী ধরনের সংস্কার এনেছে?

ناقش أهداف المرسوم العائلي الإسلامي لعام 1961 وميزاته - وما هي (أنواع الإصلاحات التي أتى بها في قانون الأسرة المسلمة؟)

ভূমিকা:

ব্রিটিশ বা পাকিস্তান আমলে মুসলিম ব্যক্তিগত আইনগুলো মূলত প্রথা ও বিভিন্ন ফিকহী মতামতের ওপর ভিত্তি করে চলত, যা অনেক সময় নারীদের অধিকার সুরক্ষায় পর্যাপ্ত ছিল না। এই প্রেক্ষাপটে নারীদের অধিকার রক্ষা এবং পারিবারিক আইনে সমতা আনার লক্ষ্যে আইয়ুব খান সরকার ১৯৬১ সালে 'মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ' (Muslim Family Laws Ordinance, 1961) জারি করেন। এটি বাংলাদেশের মুসলিম পারিবারিক আইনের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী সংস্কার।

১. অধ্যাদেশের পটভূমি ও উদ্দেশ্য (Objectives):

১৯৫৫ সালে গঠিত 'রশিদ কমিশন'-এর সুপারিশের ভিত্তিতে এই অধ্যাদেশ প্রণীত হয়। এর প্রধান উদ্দেশ্যগুলো হলো:

- **বহুবিবাহ নিয়ন্ত্রণ:** পুরুষদের অবাধ বহুবিবাহের লাগাম টেনে ধরা এবং শরিয়তের শর্ত সাপেক্ষে তা নিয়ন্ত্রণ করা।
- **তালাক নিয়ন্ত্রণ:** রাগের মাথায় তাৎক্ষণিক তালাক রোধ করা এবং সমঝোতার সুযোগ সৃষ্টি করা।
- **এতিম নাতি-নাতনির উত্তরাধিকার:** দাদা বেঁচে থাকা অবস্থায় বাবা মারা গেলে এতিম নাতি-নাতনিরা যেন সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত না হয়, তা নিশ্চিত করা।
- **নারীর অধিকার রক্ষা:** মোহরানা ও ভরণ-পোষণ আদায়ে আইনি সহায়তা সহজ করা।

২. অধ্যাদেশের প্রধান বৈশিষ্ট্য ও সংস্কারসমূহ (Features & Reforms):

এই অধ্যাদেশটি মোট ১৪টি ধারা সম্বলিত। এর মাধ্যমে প্রচলিত মুসলিম আইনে যে সংস্কারগুলো আনা হয়েছে, তা নিচে আলোচনা করা হলো:

ক. এতিম নাতি-নাতনির উত্তরাধিকার (ধারা ৪):

- **পূর্বের আইন:** প্রচলিত হানাফি ফিকহ অনুযায়ী, দাদা বেঁচে থাকা অবস্থায় বাবা মারা গেলে, বাবার সন্তানেরা (নাতি-নাতনি) দাদার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হতো।

- **সংস্কার:** এই অধ্যাদেশের ৪ ধারায় বিধান করা হয়েছে যে, মৃত ব্যক্তির ছেলে বা মেয়ে যদি তার জীবদ্দশায় মারা যায়, তবে সেই মৃত ছেলে বা মেয়ের সন্তানেরা (নাতি-নাতনি) সেই পরিমাণ সম্পত্তি পাবে, যা তাদের পিতা বা মাতা বেঁচে থাকলে পেতেন। একে 'প্রতিনিধিত্বের নীতি' (Doctrine of Representation) বলা হয়।

খ. বহুবিবাহ নিয়ন্ত্রণ (ধারা ৬):

- **পূর্বের আইন:** একজন পুরুষ একসাথে ৪ জন স্ত্রী রাখতে পারত এবং কারো অনুমতির প্রয়োজন ছিল না।

- **সংস্কার:** ৬ ধারা অনুযায়ী, কোনো পুরুষ প্রথম স্ত্রী থাকা অবস্থায় সালিশি পরিষদের (Arbitration Council) লিখিত অনুমতি ছাড়া দ্বিতীয় বিবাহ করতে পারবে না। অনুমতি ছাড়া বিবাহ করলে তাকে ১ বছর জেল ও ১০,০০০ টাকা জরিমানা দিতে হবে এবং মোহরানা সাথে সাথে পরিশোধ করতে হবে।

গ. তালাক প্রদান পদ্ধতি (ধারা ৭):

- **সংস্কার:** তালাক দেওয়ার পর স্থানীয় চেয়ারম্যান ও স্ত্রীকে লিখিত নোটিশ দেওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। নোটিশ দেওয়ার পর ৯০ দিন পর্যন্ত তালাক কার্যকর হবে না। এই সময়ে সালিশি পরিষদ আপস-মীমাংসার চেষ্টা করবে।

ঘ. বিবাহ রেজিস্ট্রেশন (ধারা ৩ ও ৫):

- **সংস্কার:** প্রতিটি মুসলিম বিবাহ রেজিস্ট্রি করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল (যা পরে ১৯৭৪ সালের আইনে আরও শক্তিশালী করা হয়)।

ঙ. মোহরানা বৃদ্ধি (ধারা ১০):

- **সংস্কার:** মোহরানা পরিশোধের পদ্ধতি কাবিননামায় উল্লেখ না থাকলে পুরো মোহরানা 'তাৎক্ষণিক' বা 'চাওয়ামাত্র দেওনদার' (Prompt Dower) হিসেবে গণ্য হবে।

চ. বিবাহের বয়স:

- **সংস্কার:** মেয়েদের বিবাহের ন্যূনতম বয়স ১৬ বছর (বর্তমানে ১৮) এবং ছেলেদের ১৮ বছর (বর্তমানে ২১) নির্ধারণ করা হয়েছিল।

৩. অধ্যাদেশের সমালোচনা ও মূল্যায়ন:

এই অধ্যাদেশের কিছু ধারা (বিশেষ করে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত ৪ ধারা) নিয়ে উলামায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তাদের মতে, এটি শরিয়তের মিরাস বন্টন নীতির সাথে সাংঘর্ষিক। তবে রাষ্ট্রীয় আইনে এটি বলবৎ রয়েছে এবং এতিমদের সুরক্ষায় আদালত এটি প্রয়োগ করে থাকে।

উপসংহার:

মুসলিম পরিবার অধ্যাদেশ ১৯৬১ নারীদের আইনি রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করছে। এটি পুরুষদের স্বেচ্ছাচারিতা কমিয়ে পারিবারিক জীবনে ভারসাম্য ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

প্রশ্ন-১১: দাম্পত্য অধিকার পুনরুদ্ধার (Restitution of Conjugal Rights) বলতে কী বোঝায়? কোন পরিস্থিতিতে আদালত এ অধিকার পুনরুদ্ধারের আদেশ দেন—পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ ১৯৮৫-এর আলোকে ব্যাখ্যা কর।

ما المقصود بـ "استرداد الحقوق الزوجية"؟ واشرح الظروف التي تأمر فيها المحكمة بإعادة هذا الحق في ضوء مرسوم محكمة الأسرة لعام 1985)

ভূমিকা:

বিবাহের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো স্বামী-স্ত্রীর একত্রবাস এবং দাম্পত্য জীবন যাপন করা। যদি কোনো পক্ষ যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়াই অপর পক্ষকে ছেড়ে চলে যায়, তবে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ তাকে ফিরে পাওয়ার জন্য আদালতে যে মামলা করে, তাকে 'দাম্পত্য অধিকার পুনরুদ্ধার'-এর মামলা বলা হয়।

১. দাম্পত্য অধিকার পুনরুদ্ধারের সংজ্ঞা:

আইনি সংজ্ঞা: যখন স্বামী বা স্ত্রী যুক্তিসঙ্গত কোনো কারণ (Lawful Excuse) ছাড়াই অন্যের সাহচর্য ত্যাগ করে বা দাম্পত্য দায়িত্ব পালনে বিরত থাকে, তখন আদালত যে আদেশের মাধ্যমে বিবাদী পক্ষকে বাদীর সাথে বসবাস করতে নির্দেশ দেন, তাকে 'Restitution of Conjugal Rights' বা দাম্পত্য অধিকার পুনরুদ্ধার বলা হয়।

২. পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ ১৯৮৫-এর এখতিয়ার:

পূর্বে এই মামলা সাধারণ দেওয়ানি আদালতে হতো, যা ছিল দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া। 'পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ ১৯৮৫'-এর ৫ ধারা অনুযায়ী, এখন শুধুমাত্র 'পারিবারিক আদালত' (Family Court) এই মামলার বিচার করতে পারে। এটি দ্রুত বিচার নিশ্চিত করে।

৩. আদালত কখন পুনরুদ্ধারের আদেশ দেন (Circumstances for Decree):

স্বামী বা স্ত্রী এই মামলা করলে আদালত নিচের বিষয়গুলো যাচাই করে আদেশ দেন:

- **বৈধ বিবাহ:** বাদীর সাথে বিবাদীর বিবাহটি বৈধ ও বলবৎ থাকতে হবে।
- **বিনা কারণে পৃথক থাকা:** বিবাদী (সাধারণত স্ত্রী) যদি কোনো শরয়ী বা আইনি কারণ ছাড়াই স্বামীর ঘর ছেড়ে চলে যান।
- **স্বামীর সদিচ্ছা:** স্বামী যদি স্ত্রীকে নিয়ে সংসার করতে আন্তরিক হন এবং তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারেন।

৪. আদালত কখন পুনরুদ্ধারের আদেশ দেন না (Defenses):

স্ত্রী যদি নিচের কারণগুলো প্রমাণ করতে পারেন, তবে আদালত স্বামীকে দাম্পত্য অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার আদেশ দেবেন না:

১. **নিষ্ঠুরতা (Cruelty):** স্বামী যদি স্ত্রীর ওপর শারীরিক বা মানসিক নির্যাতন করেন।

২. **মোহরানা অপরিশোধ:** স্বামী যদি 'তাৎক্ষণিক মোহরানা' (Prompt Dower) পরিশোধ না করেন।

৩. **মিথ্যা অপবাদ:** স্বামী যদি স্ত্রীর চরিত্রের ওপর মিথ্যা অপবাদ (লি'আন) দেন।

৪. **শরীয়ত বিরোধী নির্দেশ:** স্বামী যদি স্ত্রীকে ইসলাম বিরোধী কাজ করতে বাধ্য করেন।

৫. **অবৈধ দ্বিতীয় বিবাহ:** স্বামী যদি ১৯৬১ সালের আইন লঙ্ঘন করে দ্বিতীয় বিয়ে করেন।

৬. **বসবাসের অনুপযুক্ত পরিবেশ:** স্বামীর বাড়ি যদি স্ত্রীর জীবন বা স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হয়।

৫. ডিক্রি কার্যকর করার পদ্ধতি:

আদালত পুনরুদ্ধারের রায় (Decree) দিলেও, স্ত্রীকে পুলিশ দিয়ে ধরে এনে স্বামীর হাতে তুলে দেওয়া হয় না। এটি মানবিক মর্যাদার পরিপন্থী।

- **পদ্ধতি:** স্ত্রী যদি আদালতের আদেশ অমান্য করে স্বামীর ঘরে না ফিরে, তবে আদালত স্ত্রীর সম্পত্তি ক্রোক (Attachment) করতে পারেন অথবা তার ভরণ-পোষণ বন্ধ করে দিতে পারেন।

উপসংহার:

'দাম্পত্য অধিকার পুনরুদ্ধার' মূলত একটি পারস্পরিক অধিকার। তবে আধুনিক আইনি ব্যবস্থায় আদালত জোর করে সংসার করানোর চেয়ে সমঝোতার ওপর বেশি গুরুত্ব দেন। পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশের মূল লক্ষ্য হলো—শুধু রায় দেওয়া নয়, বরং আপস-মীমাংসার মাধ্যমে সংসার টিকিয়ে রাখা।

প্রশ্ন-১২: মুসলিম বিবাহ ও তালাক (রেজিস্ট্রেশন) আইন ১৯৭৪ ও ১৯৯৪ (সংশোধিত)-এর আওতায় বিবাহ ও তালাক রেজিস্ট্রেশনের প্রক্রিয়া ও গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। রেজিস্ট্রেশন না করার শাস্তি কী?

حلل عملية تسجيل الزواج والطلاق بموجب قانون تسجيل الزواج والطلاق الإسلامي لعامي 1974 و 1994 (المعدل) وأهميته - وما هي عقوبة عدم التسجيل؟)

ভূমিকা:

বাংলাদেশে মুসলিম বিবাহ ও তালাকের আইনি বৈধতা প্রমাণের একমাত্র দালিলিক মাধ্যম হলো রেজিস্ট্রেশন। মৌখিক বিবাহ বা তালাক সামাজিকভাবে স্বীকৃত হলেও আদালতে তা প্রমাণ করা কঠিন। তাই সরকার 'মুসলিম বিবাহ ও তালাক (রেজিস্ট্রেশন) আইন ১৯৭৪' প্রণয়ন করে, যা ১৯৯৪ সালে সংশোধন করা হয়।

১. রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া (Registration Process):

এই আইনের অধীনে সরকার প্রতিটি এলাকার জন্য একজন 'নিকাহ রেজিস্ট্রার' বা 'কাজী' নিয়োগ দেন। রেজিস্ট্রেশনের নিয়মগুলো হলো:

- **নিকাহ রেজিস্ট্রার:** বিবাহ বা তালাক সম্পন্ন হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট এলাকার কাজীর কাছে যেতে হবে।

- **তথ্য প্রদান:** কাজী নির্দিষ্ট ফরম বা রেজিস্টার বইতে (যাকে বালাম বই বা নিকাহনামা বলে) বর-কনের নাম, বয়স, মোহরানা, শর্তাবলি ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করবেন।

- **স্বাক্ষর:** বর, কনে, উকিল (প্রতিনিধি), সাক্ষী এবং বিবাহ পড়ানেওয়ালা ব্যক্তি রেজিস্টারে স্বাক্ষর করবেন বা টিপসই দেবেন।

- **কাবিননামা:** রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হলে কাজী পক্ষগণকে 'কাবিননামা' বা বিবাহের সত্যায়িত কপি প্রদান করবেন।

- **সময়সীমা:** বিবাহ যে দিন হবে, সেদিনই রেজিস্ট্রি করা উত্তম। তবে বিশেষ কারণে দেরি হলে ৩০ দিনের মধ্যে অবশ্যই রেজিস্ট্রি করতে হবে।

২. রেজিস্ট্রেশনের গুরুত্ব (Importance):

- **আইনি প্রমাণ:** আদালতে মোহরানা আদায়, ভরণ-পোষণ দাবি বা উত্তরাধিকার সাব্যস্ত করার জন্য কাবিননামাই একমাত্র প্রমাণ।

- **প্রতারণা রোধ:** রেজিস্ট্রেশন থাকলে স্বামী বা স্ত্রী কেউ বিয়ের কথা অস্বীকার করতে পারে না।

- **বাল্যবিবাহ রোধ:** রেজিস্ট্রেশনের সময় জন্মনিবন্ধন বা জাতীয় পরিচয়পত্র যাচাই করা হয়, ফলে বয়স জালিয়াতি ও বাল্যবিবাহ কমে।

- **তালাকের প্রমাণ:** তালাক রেজিস্ট্রেশন না করলে স্বামী পরে দাবি করতে পারে যে সে তালাক দেয়নি, অথবা স্ত্রী দাবি করতে পারে যে তার তালাক হয়নি। এতে আইনি জটিলতা বাড়ে।

৩. রেজিস্ট্রেশন না করার শাস্তি (Penalty):

১৯৭৪ সালের আইনের ৫ ধারা অনুযায়ী বিবাহ রেজিস্ট্রেশন না করা একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

- **শাস্তি:** যদি কেউ বিবাহ সম্পন্ন করার পর তা রেজিস্ট্রি না করে, তবে তার **২ বছর পর্যন্ত বিনাশ্রম কারাদণ্ড** অথবা **৩,০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা** অথবা **উভয় দণ্ড** হতে পারে।

- **তালাক রেজিস্ট্রেশন:** তালাকের ক্ষেত্রেও রেজিস্ট্রেশন না করলে একই ধরনের শাস্তির বিধান রয়েছে, বিশেষ করে তালাক কার্যকরের প্রমাণ হিসেবে এটি জরুরি।

৪. কাজীর এখতিয়ার ও ফি:

সরকার নির্ধারিত ফি অনুযায়ী কাজী রেজিস্ট্রেশন ফি আদায় করবেন। অতিরিক্ত ফি নেওয়া বেআইনি। সাধারণত মোহরানার পরিমাণের ওপর ভিত্তি করে ফি নির্ধারিত হয় (যেমন: প্রতি হাজারে নির্দিষ্ট টাকা)।

উপসংহার:

বিবাহ ও তালাক রেজিস্ট্রেশন কেবল আইনি বাধ্যবাধকতা নয়, এটি নাগরিক দায়িত্বও বটে। একটি সুশৃঙ্খল সমাজ ব্যবস্থা এবং নারীদের অধিকার নিশ্চিতকল্পে ১৯৭৪ সালের এই আইনটি অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করছে। রেজিস্ট্রেশনবিহীন বিবাহ নারীদের জন্য চরম ঝুঁকির কারণ হতে পারে।

প্রশ্ন-১৩: স্ত্রীর ভরণ-পোষণ (Maintenance) সম্পর্কে মুসলিম পরিবার অধ্যাদেশ ১৯৬১-এর বিধানগুলো কী কী? স্ত্রী কখন ভরণ-পোষণের অধিকার হারায়?

(ما هي أحكام مرسوم العائلة المسلمة لعام 1961 بخصوص نفقة الزوجة؟ ومتى تفقد الزوجة حقها في النفقة؟)

ভূমিকা:

ইসলামি শরিয়তে স্ত্রীর ভরণ-পোষণ বা 'নাফাকাহ' স্বামীর ওপর ফরজ। তবে অনেক সময় স্বামীরা এই দায়িত্ব পালনে অবহেলা করে। এই সমস্যা নিরসনে এবং নারীদের দ্রুত প্রতিকার পাওয়ার লক্ষ্যে 'মুসলিম পরিবার অধ্যাদেশ ১৯৬১'-এ ভরণ-পোষণ আদায়ের একটি কার্যকর ও সহজ পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়েছে। এটি দেওয়ানি আদালতের দীর্ঘসূত্রিতা থেকে নারীদের মুক্তি দিয়েছে।

১. মুসলিম পরিবার অধ্যাদেশ ১৯৬১-এর বিধানাবলি (Provisions of MFLO 1961):

এই অধ্যাদেশের ৯ ধারায় স্ত্রীর ভরণ-পোষণ সংক্রান্ত বিধান বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

ক. আবেদনের অধিকার (Right to Apply):

৯(১) ধারা অনুযায়ী, যদি কোনো স্বামী তার স্ত্রীকে যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়া ভরণ-পোষণ না দেয় বা দিতে অবহেলা করে, অথবা একাধিক স্ত্রী থাকলে তাদের মধ্যে সমান আচরণ না করে, তবে স্ত্রী স্থানীয় চেয়ারম্যান বা সালিশি পরিষদের কাছে ভরণ-পোষণের জন্য আবেদন করতে পারেন।

খ. সালিশি পরিষদ গঠন ও রায়:

আবেদন পাওয়ার পর চেয়ারম্যান একটি 'সালিশি পরিষদ' গঠন করবেন (চেয়ারম্যান এবং স্বামী ও স্ত্রীর একজন করে প্রতিনিধি নিয়ে)। এই পরিষদ বিষয়টি যাচাই-বাছাই করে স্বামীর ওপর একটি নির্দিষ্ট অংকের মাসিক ভরণ-পোষণ ধার্য করে রায় (Certificate) প্রদান করবে।

গ. রিভিশন বা আপিল (Revision):

৯(২) ধারা অনুযায়ী, সালিশি পরিষদের রায়ে কোনো পক্ষ সংক্ষুব্ধ হলে, রায় প্রদানের ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট 'সহকারী জজ' (পারিবারিক আদালত)-এর কাছে রিভিশন দায়ের করতে পারবে। বিচারকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

ঘ. বকেয়া আদায় (Recovery):

৯(৩) ধারা অনুযায়ী, নির্ধারিত ভরণ-পোষণ যদি স্বামী পরিশোধ না করে, তবে তা 'বকেয়া ভূমি রাজস্ব' (Arrears of Land Revenue) হিসেবে সরকারিভাবে আদায় করা হবে এবং স্ত্রীকে প্রদান করা হবে।

২. স্ত্রী কখন ভরণ-পোষণের অধিকার হারায়? (Loss of Maintenance Right):

শরিয়ত ও আইনের দৃষ্টিতে কিছু বিশেষ পরিস্থিতিতে স্ত্রী স্বামীর কাছ থেকে ভরণ-পোষণ পাওয়ার অধিকার হারিয়ে ফেলে। ফিকহের পরিভাষায় একে 'নুশুজ' বা অবাধ্যতা বলা হয়।

ক. স্বামীর অবাধ্য হলে (Disobedience):

স্ত্রী যদি যুক্তিসঙ্গত কোনো কারণ (যেমন: স্বামীর নিষ্ঠুরতা বা মোহরানা না দেওয়া) ছাড়াই স্বামীর আদেশ অমান্য করে বা স্বামীর ঘর ছেড়ে চলে যায়।

খ. অন্যত্র বসবাস করলে:

স্ত্রী যদি স্বামীর অনুমতি ছাড়া বা শরিয়তসম্মত কারণ ছাড়া স্বামীর বাড়ির বাইরে বসবাস করে।

গ. ধর্মত্যাগ করলে (Apostasy):

স্ত্রী যদি (নাউজুবিল্লাহ) ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে অন্য ধর্ম গ্রহণ করে, তবে সাথে সাথে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যাবে এবং সে ভরণ-পোষণ পাবে না।

ঘ. আটক বা কারাদণ্ড হলে:

স্ত্রী যদি কোনো অপরাধে কারাগারে আটক থাকে, ফলে স্বামীর কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে না পারে।

ঙ. অপহরণ হলে:

স্ত্রী যদি অপহৃত হয়, তবে ওই সময়ের জন্য ভরণ-পোষণ পাবে না।

৩. আদালতের বিশেষ ক্ষমতা:

যদিও সাধারণ নিয়মে অবাধ্য স্ত্রী খরচ পায় না, কিন্তু পারিবারিক আদালত অনেক সময় মানবিক দিক বিবেচনা করে বিবাহ বিচ্ছেদ না হওয়া পর্যন্ত নামমাত্র ভরণ-পোষণ মঞ্জুর করে থাকে।

উপসংহার:

১৯৬১ সালের অধ্যাদেশটি নারীদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তার জন্য একটি মাইলফলক। এর মাধ্যমে স্ত্রীরা বিনা খরচে এবং দ্রুততম সময়ে স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে তাদের ন্যায্য পাওনা আদায় করতে সক্ষম হচ্ছে।

প্রশ্ন-১৪: পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ ১৯৮৫ অনুযায়ী পারিবারিক আদালতের এখতিয়ার ও কার্যপ্রণালী আলোচনা কর। এ আদালত কোন কোন বিষয়ে রায় দিতে পারে?

ناقش اختصاص محكمة الأسرة بموجب مرسوم محكمة الأسرة لعام 1985 وإجراءاتها - وما هي القضايا التي يمكن لهذه المحكمة أن تحكم فيها؟)

ভূমিকা:

বাংলাদেশে পারিবারিক বিরোধগুলো দ্রুত ও সুষ্ঠুভাবে নিষ্পত্তির লক্ষ্যে 'পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ ১৯৮৫' (Family Courts Ordinance, 1985) জারি করা হয়। এই আইনের মাধ্যমে সহকারী জজ আদালতগুলোকে 'পারিবারিক আদালত' হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এই আদালত দেওয়ানি কার্যবিধির জটিলতা এড়িয়ে সহজ পদ্ধতিতে বিচারকার্য পরিচালনা করে।

১. পারিবারিক আদালতের এখতিয়ার (Jurisdiction):

এই অধ্যাদেশের ৫ ধারা অনুযায়ী, পারিবারিক আদালত ৫টি সুনির্দিষ্ট বিষয়ে একচ্ছত্র বিচারিক এখতিয়ার রাখে। অর্থাৎ এই ৫টি বিষয় নিয়ে অন্য কোনো দেওয়ানি আদালতে মামলা করা যাবে না। বিষয়গুলো হলো:

1. **বিবাহ বিচ্ছেদ (Dissolution of Marriage):** তালাক, ফাসখ, খুলা বা অন্য যেকোনো উপায়ে বিবাহ বিচ্ছেদ।
2. **দাম্পত্য অধিকার পুনরুদ্ধার (Restitution of Conjugal Rights):** স্বামী বা স্ত্রীকে ঘরে ফিরিয়ে আনার মামলা।
3. **মোহরানা (Dower):** তাৎক্ষণিক বা বিলম্বিত মোহরানা আদায়ের মামলা।
4. **ভরণ-পোষণ (Maintenance):** স্ত্রী, সন্তান বা পিতামাতার ভরণ-পোষণ আদায়।
5. **অভিভাবকত্ব ও সন্তানের জিম্মাদারি (Guardianship and Custody):** নাবালক সন্তানের শরীর বা সম্পত্তির অভিভাবকত্ব।

২. পারিবারিক আদালতের কার্যপ্রণালী (Procedure):

পারিবারিক আদালতের বিচার পদ্ধতি সাধারণ আদালতের চেয়ে ভিন্ন এবং সহজতর। এর ধাপগুলো নিচে আলোচনা করা হলো:

ক. আরজি দাখিল (Filing Plaint):

ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ নির্দিষ্ট কোর্ট ফি দিয়ে আদালতে আরজি দাখিল করবে। একটি আরজিতে একাধিক দাবি (যেমন: মোহরানা ও ভরণ-পোষণ একসাথে) করা যায়।

খ. সমন জারি ও জবাব দাখিল:

আদালত বিবাদীর প্রতি সমন জারি করবেন। বিবাদী উপস্থিত হয়ে লিখিত জবাব (Written Statement) দাখিল করবেন।

গ. প্রাক-বিচার শুনানি (Pre-trial Hearing):

এটি এই আদালতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। বিচারক সাক্ষ্য গ্রহণের আগে উভয় পক্ষকে নিয়ে রুদ্ধদ্বার বৈঠকে বসবেন এবং আপস-মীমাংসার (Compromise) চেষ্টা করবেন।

- যদি আপস হয়ে যায়, তবে সেই অনুযায়ী ডিক্রি বা রায় দেওয়া হবে।

ঘ. বিচার বা সাক্ষ্য গ্রহণ (Trial):

যদি আপস প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়, তবে আদালত বিচারকার্য শুরু করবেন। সাক্ষী গ্রহণ, জেরা এবং যুক্তি-তর্ক উপস্থাপন করা হবে।

ঙ. বিচার-উত্তর শুনানি (Post-trial Hearing):

রায় ঘোষণার আগেও বিচারক শেষবারের মতো উভয় পক্ষকে আপসের সুযোগ দেবেন। যদি তখনও আপস না হয়, তবে আদালত চূড়ান্ত রায় ঘোষণা করবেন।

৩. আপিল (Appeal):

পারিবারিক আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে জেলা জজ আদালতে আপিল করা যায়। আপিলের সময়সীমা রায় প্রদানের তারিখ থেকে ৩০ দিন।

উপসংহার:

পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ ১৯৮৫ বাংলাদেশে পারিবারিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে। বিশেষ করে 'প্রাক-বিচার শুনানি' বা আপসের ব্যবস্থাটি হাজারো ভাঙনন্মুখ পরিবারকে রক্ষা করতে সাহায্য করছে, যা ইসলামি শরিয়তের 'ইসলাহ' (সমঝোতা) নীতিরই প্রতিফলন।

প্রশ্ন-১৫: মুসলিম পরিবার অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী তালাকের ক্ষেত্রে সালিশি পরিষদের (Arbitration Council) ভূমিকা কী? এটি কীভাবে বিচ্ছেদ কার্যকর করতে সাহায্য করে?

(ما هو دور "مجلس التحكيم" في قضايا الطلاق بموجب مرسوم العائلة المسلمة؟ وكيف يساعد في تنفيذ الانفصال؟)

ভূমিকা:

ইসলামে তালাক বৈধ হলেও তা সবচেয়ে অপ্রিয় কাজ। রাগের মাথায় দেওয়া তালাক যাতে সাথে সাথে কার্যকর হয়ে সংসার ভেঙে না যায়, সে জন্য 'মুসলিম পরিবার অধ্যাদেশ ১৯৬১'-এর ৭ ধারায় 'সালিশি পরিষদ' বা Arbitration Council-এর বিধান রাখা হয়েছে। তালাক প্রক্রিয়ায় এই পরিষদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এটি একটি 'প্রশাসনিক ও বিচারিক' সংস্থা হিসেবে কাজ করে।

১. সালিশি পরিষদের গঠন (Constitution):

অধ্যাদেশের সংজ্ঞানুযায়ী, সালিশি পরিষদ গঠিত হয় তিনজন সদস্য নিয়ে:

1. **চেয়ারম্যান:** স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বা পৌরসভার মেয়র/কাউন্সিলর।
2. **স্বামীর প্রতিনিধি:** স্বামী কর্তৃক মনোনীত একজন ব্যক্তি।
3. **স্ত্রীর প্রতিনিধি:** স্ত্রী কর্তৃক মনোনীত একজন ব্যক্তি।

২. তালাক প্রক্রিয়ায় সালিশি পরিষদের ভূমিকা (Role in Divorce Process):

ক. নোটিশ গ্রহণ:

তালাক প্রদানের পর স্বামী যখন চেয়ারম্যানের কাছে নোটিশ পাঠান, তখন থেকেই সালিশি পরিষদের কাজ শুরু হয়। নোটিশ পাওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে চেয়ারম্যান উভয় পক্ষকে প্রতিনিধি পাঠানোর নির্দেশ দেন এবং পরিষদ গঠন করেন।

খ. আপস-মীমাংসার উদ্যোগ (Reconciliation Attempt):

৭(৪) ধারা অনুযায়ী, সালিশি পরিষদের প্রধান ও বাধ্যতামূলক কাজ হলো স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে সমঝোতা বা পুনর্মিলন ঘটানোর চেষ্টা করা।

- পরিষদ উভয় পক্ষের অভিযোগ শুনবে।
- পারিবারিক সমস্যাগুলো চিহ্নিত করবে।
- প্রয়োজনে উভয়কে একান্তে কথা বলার সুযোগ দেবে।

গ. সময়সীমা:

নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৯০ দিন (তিন মাস) পর্যন্ত সালিশি পরিষদ এই প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে। এই ৯০ দিন সময়কালকে ইদ্দত বা চিন্তাভাবনার সময় হিসেবে গণ্য করা হয়।

৩. বিচ্ছেদ কার্যকর বা রহিতকরণে ভূমিকা:

ক. সমঝোতা সফল হলে:

যদি পরিষদের চেষ্টায় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মিল হয়ে যায় এবং স্বামী তালাক প্রত্যাহার করে নেন, তবে সালিশি পরিষদ তা লিপিবদ্ধ করবে। ফলে তালাকটি আর কার্যকর হবে না এবং তাদের সংসার টিকে যাবে।

খ. সমঝোতা ব্যর্থ হলে:

যদি ৯০ দিনের মধ্যে কোনো সমঝোতা না হয়, অথবা কোনো পক্ষ প্রতিনিধি না পাঠায়, তবে ৯০ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর তালাকটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে কার্যকর

হয়ে যাবে। তখন চেয়ারম্যান তালাক কার্যকর হওয়ার একটি প্রত্যয়নপত্র বা রেজিস্ট্রেশনের অনুমতি দেবেন।

গ. গর্ভাবস্থায় ভূমিকা:

স্ত্রী গর্ভবতী হলে সালিশি পরিষদের সময়সীমা সন্তান প্রসব পর্যন্ত বর্ধিত হয়। এই সময়ে পরিষদ স্বামীর কাছ থেকে স্ত্রীর গর্ভকালীন খরচ আদায়ে ভূমিকা রাখতে পারে।

৪. আইনি গুরুত্ব:

উচ্চ আদালতের বিভিন্ন রায়ে বলা হয়েছে যে, সালিশি পরিষদ গঠন না করা বা নোটিশ না দেওয়া তালাক কার্যকর হওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। যদিও বর্তমানে নোটিশ দিলেই তালাক কার্যকর হয়ে যায় (পরিষদ গঠিত হোক বা না হোক), তবুও আইনি প্রক্রিয়া পূর্ণ করার জন্য পরিষদের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

উপসংহার:

সালিশি পরিষদ মূলত একটি 'পারিবারিক আদালত'-এর মতোই কাজ করে, তবে ঘরোয়া পরিবেশে। এর মূল লক্ষ্য তালাক কার্যকর করা নয়, বরং তালাক ঠেকানো। এটি ভাঙনন্মুখ পরিবারের জন্য শেষ আশার আলো হিসেবে কাজ করে।